গবেষণা অভিসন্দর্ভের সারসংক্ষেপ

(Abstract)

গবেষণা অভিসন্দর্ভের সারসংক্ষেপ (Abstract)

ভূমিকা

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫ খ্রিঃ) উপন্যাসটিকে বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাসের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। তিনি এই উপন্যাসটি সহ বাংলা ভাষায় মোট চোদ্দটি উপন্যাস রচনা করেছেন। তাঁর বেশিরভাগ উপন্যাসে ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে নরনারীর জীবনালেখ্য স্থান পেয়েছে। তবে কিছু উপন্যাসে তিনি সমাজ ও গার্হস্থ্য জীবনের প্রেক্ষিতে মানব মনস্তত্ত্বের নানা রূপকে দেখিয়েছেন। বঙ্কিম সমকালে রমেশচন্দ্র দত্ত, প্রতাপচন্দ্র ঘোষ, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রী, তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, স্বর্ণকুমারী দেবী প্রমুখ উপন্যাসের চর্চা শুরু করলেও তাঁরা কেউই নিজেদের রচনায় বঙ্কিম সৃষ্ট ইতিহাস, সমাজ, পরিবার তথা গার্হস্থ্য নিয়ন্ত্রিত মানব জীবনালেখ্যের ধারাকে অতিক্রম করতে পারেন নি। এরপর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বেশ কয়েকটি উপন্যাস রচনা করেন। তাঁর উপন্যাসগুলিতে শহুরে এবং সমাজের উচ্চকোটির মানুষেরাই প্রাধান্য পেয়েছে। রবীন্দ্র সমকালেই বাংলা উপন্যাসের আঙিনায় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আর্বিভাব ঘটে। পূর্বসূরীদের মত তিনিও উপন্যাসে সমাজের মূল স্রোতের মানুষদের জীবনালেখ্য তুলে ধরেছেন।

এরপর বাংলা উপন্যাস বিশের দশকে পদার্পণ করলে এতে নানা দিক থেকে নতুনত্ব আসতে শুরু করে। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত কল্লোল পত্রিকাকে কেন্দ্র করে দীনেশরঞ্জন দাস, গোকুল চন্দ্র নাগ, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্রের মত যুবকেরা সাহিত্যে বাস্তবতা আনার জন্য এর উপাদান খুঁজতে মূল জনসমাজের বাইরে শহরতলি, বসতি প্রভৃতি নানা অঞ্চলে পাড়ি জমান। তবে 'কল্লোল' পত্রিকা প্রকাশের আগেই ১৩২৯ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় 'কয়লাকুঠি' নামে একটি ছোটগল্প রচনা করেন, যার পটভূমি আসানসোল–রানীগঞ্জের কয়লাখনি অঞ্চল। এই অঞ্চলকে পটভূমি করে তিনি আরও কয়েকটি ছোটগল্প লেখেন। একই বিষয় নিয়ে তিনি লেখেন 'কয়লাকুঠির দেশ' উপন্যাসটি। এভাবেই প্রথমে বাংলা ছোটগল্পে এবং পরবর্তীকালে বাংলা উপন্যাসে আঞ্চলিকতার সূত্রপাত ঘটে। ফলে মূল ধারার উপন্যাস রচনার পাশাপাশি ঔপন্যাসিকেরা অন্য আর এক ধারার উপন্যাস

রচনা শুরু করেন, যেখানে মূল জনসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন কোন অঞ্চলের ভৌগোলিক প্রকৃতি থেকে শুরু করে সেখানকার জনজীবনের নানা বৈচিত্র্যময় রূপ প্রকাশিত হতে থাকে। এই উপন্যাসগুলি আঞ্চলিক উপন্যাস হিসেবে বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে নিজেদের আলাদা জায়গা করে নিয়েছে।

মূল জনসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন কোন অঞ্চলকে পটভূমি করে বাংলা সাহিত্যে অনেক উপন্যাসই রচিত হয়েছে। এর মধ্যে কিছু উপন্যাস পুরোপুরি সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাস হয়ে উঠেছে, আর বেশ কিছু উপন্যাস আঞ্চলিকতার লক্ষণযুক্ত উপন্যাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকেছে। আমরা বিশ শতকে প্রকাশিত মূল জনসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো অঞ্চলকে পটভূমি করে রচিত উপন্যাসগুলির আলোচনা ও পর্যালোচনার মাধ্যমে এগুলির কোথায়, কীভাবে আঞ্চলিক রূপ, সংস্কৃতি ও জনজীবনের জীবনচর্যার কথা শিল্পিত ও বাস্তবধর্মী হয়ে উঠেছে তা অন্বেষণে প্রয়াসী হয়েছি। আর তা করতে গিয়ে আমাদের গবেষণার বিষয়কে পূর্ণতা দিতে নিম্নোক্ত অধ্যায় বিভাজন করে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়
আঞ্চলিক উপন্যাসের সংজ্ঞা ও স্বরূপ

বিশ শতকের বাংলা উপন্যাসে আঞ্চলিকতার অন্বেষণ করতে বসলে প্রথমেই আঞ্চলিক উপন্যাসের সংজ্ঞা ও স্বরূপ নির্ণয় করতে হয়। এই অধ্যায়ে প্রাচ্যে এবং পাশ্চাত্যে উপন্যাসের আবির্ভাব ও বিবর্তনের একটি অতি সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্তের বিবরণ দিয়ে বিশ্বসাহিত্যে আঞ্চলিক উপন্যাসের আবির্ভাব ও বিকাশের একটি রূপরেখা অঙ্কন করে বিভিন্ন সাহিত্য তাত্ত্বিক, সাহিত্যের আলোচক ও সাহিত্য স্রষ্টারা আঞ্চলিক উপন্যাস সম্পর্কে যে সমস্ত অভিমত ব্যক্ত করেছেন, সেগুলি আলোচনা করে আঞ্চলিক উপন্যাসের একটি গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা নিরূপণের প্রয়াস করা হয়েছে। এই সংজ্ঞার ভিত্তিতে আঞ্চলিক উপন্যাসের বৈশিষ্ট্যগুলিও খুঁজে নেওয়া হয়েছে। পরবর্তী কালে এই বৈশিষ্ট্যগুলিকে মাপকাঠি ধরে আলোচ্য উপন্যাসগুলির আঞ্চলিক উপন্যাস হিসেবে সার্থকতা ও অসার্থকতা যাচাই করা হয়েছে। এখানে আঞ্চলিক উপন্যাসের যে কয়েকটি লক্ষণ পাওয়া গেছে, তার মধ্যে কয়েকটি হল—

- আঞ্চলিক উপন্যাসে গৃহীত অঞ্চলটির ভৌগোলিক পরিবেশের বাস্তবসম্মত বিবরণ থাকে।
- চরিত্রদের জীবন-জীবিকা তথা সমগ্র কার্যকলাপের সঙ্গে অঞ্চলটির ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকে।
- চরিত্রদের আচার-আচরণ, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যরুচি-খাদ্যতালিকার বাস্তব সম্মত বর্ণনা থাকে।
- উপন্যাসে ভাষায় ও চরিত্রদের কথোপকথনে আঞ্চলিক শব্দের বাহুল্য থাকে।
- জন্ম-মৃত্য-বিবাহ বা অন্য কোন আচার অনুষ্ঠানের বিবরণ থাকে। এজন্য অঞ্চলটির নিজস্ব লোকাচার, লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কৃতিকে তুলে আনা হয়।
- উপন্যাসে নায়ক-নায়িকা থাকলেও অঞ্চলটিই সবথেকে বেশি গুরুত্ব পায়, তাকে সরিয়ে নিলে এর উপন্যাস হয়ে ওঠার অনেক লক্ষণ চলে যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়
বাংলা উপন্যাসে আঞ্চলিকতার প্রকাশ ও বিস্তারের সাধারণ পরিচয় সংক্ষেপ

এই অধ্যায়ে বাংলা উপন্যাসে কিভাবে আঞ্চলিকতার প্রকাশ ও বিস্তার ঘটেছে সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তারপর বাংলা সাহিত্যে কোনো বিশেষ অঞ্চলকে পটভূমি করে যে সমস্ত ঔপন্যাসিক উপন্যাস লিখছেন, তাঁদের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে আঞ্চলিক উপন্যাসের আলোচনায় আসে এমন উপন্যাসগুলির সাধারণ পরিচয় প্রদান করা হয়েছে। এরপর বিশ শতকে আঞ্চলিক পটভূমিকায় রচিত উপন্যাসগুলিকে সময়ক্রমের ভিত্তিতে বিশ শতকের প্রথমার্ধের বাংলা উপন্যাসে আঞ্চলিকতা এবং বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের বাংলা উপন্যাসে আঞ্চলিকতা নামে দু'টি অর্ধে ভাগ করে দু'টি পৃথক তালিকা তৈরি করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়

বিশ শতকের প্রথমার্ধের বাংলা উপন্যাসে আঞ্চলিকতা

বিশ শতকের বিশের দশক থেকেই বাংলা কথাসাহিত্যে আঞ্চলিকতার লক্ষণ প্রকটিত হতে শুরু করে। প্রথমে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের কয়লাকুঠি বিষয়ক ছোটগল্পগুলিতে এই লক্ষণ দেখা যায়, যা তাঁর এই শতকের দ্বিতীয়ার্ধে প্রকাশিত 'কয়লাকুঠির দেশ' উপন্যাসেও থাকায় উপন্যাসটি এই অর্ধেই আলোচিত হয়েছে। এছাড়াও এই অর্ধে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজকুমার রায়চৌধুরী, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সতীনাথ ভাদুড়ী এবং সর্বোপরি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে সমস্ত উপন্যাসে আঞ্চলিকতার লক্ষণগুলি প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলির আঞ্চলিক লক্ষণ অন্বেষণ করা হয়েছে। এই উপন্যাসগুলির মধ্যে কয়েকটি হল—

ঔপন্যাসিকের নাম	**উপন্যাসের নাম ও প্রথম প্রকাশকাল**
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়	কয়লাকুঠির দেশ – ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ।
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়	পদ্মানদীর মাঝি – ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ।
সরোজকুমার রায়চৌধুরী	নতুন ফসল – ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দ।
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	আরণ্যক – ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দ।
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	কালিন্দী – ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দ।
	গণদেবতা – ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দ।
	পঞ্চগ্রাম – ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দ।
	কবি – ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দ।
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	উপনিবেশ– ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দ।
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	হাঁসুলী বাঁকের উপকথা – ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ।
সতীনাথ ভাদুড়ী	ঢোঁড়াই চরিত মানস (প্রথম চরণ)– ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দ
	ও (দ্বিতীয় চরণ)– ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ।
	ইত্যাদি।

চতুর্থ অধ্যায়

বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের বাংলা উপন্যাসে আঞ্চলিকতা

বিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলা উপন্যাসে যে আঞ্চলিকতার আবির্ভাব ঘটে, এই শতকের দ্বিতীয়ার্ধে তাতে আরও বেশি ব্যাপকতা আসে। এই অধ্যায় বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে রচিত উপন্যাসগুলির আঞ্চলিক লক্ষণ অন্বেষণ করে সেগুলি সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাস হয়ে উঠতে পেরেছে কি না তা নির্ণয়ের প্রয়াস করা হয়েছে। এখানে যে সকল উপন্যাস আলোচিত হয়েছে তার মধ্যে কয়েকটি হল—

ঔপন্যাসিকের নাম	**উপন্যাসের নাম ও প্রথম প্রকাশকাল**
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	নাগিনী কন্যার কাহিনী – ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ।
অদ্বৈত মল্লবর্মণ	তিতাস একটি নদীর নাম ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ।
সমরেশ বসু	গঙ্গা – ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দ।
প্রফুল্ল রায়	পূর্বপার্বতী – ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দ।
অমিয়ভূষণ মজুমদার	গড় শ্রীখণ্ড – ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দ।
সুবোধ ঘোষ	শতকিয়া – ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দ।
প্রফুল্ল রায়	কেয়াপাতার নৌকো– ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দ।
মহাশ্বেতা দেবী	অরণ্যের অধিকার– ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দ।
দেবেশ রায়	তিস্তাপারের বৃত্তান্ত – ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দ।
	ইত্যাদি।

উপসংহার

পূর্বের আলোচনা থেকে বাংলা আঞ্চলিক উপন্যাসগুলির একটি বিস্তারিত ছবি উঠে এসেছে। এই উপন্যাসগুলিতে বাংলার মূল ভূখণ্ডের মধ্যে থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া জনজীবনের যে পরিচয় পাওয়া গেছে তার ভিত্তিতে এই উপন্যাসগুলি বাংলা আঞ্চলিক উপন্যাসের ধারাকে কীভাবে সমৃদ্ধ করেছে, এখানে তার আলোচনা করা হয়েছে। পাশাপাশি আবির্ভাব কাল থেকে বাংলা উপন্যাসে আঞ্চলিকতার বিবর্তনের রূপচিত্রটিও ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।